দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর
তারিখঃ০২/০৩/২০২৬ (পৃঃ০৪)

‘কৃষি রূপান্তরে টেকসই কৃষি ও বাজার সংস্কার’

ড. মো. আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশের কৃষি এক জটিল কিন্তু সম্ভাবনাময় সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছে। একদিকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, অন্যদিকে কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সংকট, অদক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব; সব মিলিয়ে কৃষি খাতকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ বন্ধুর পথ পেরিয়ে, বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কৃষির এই অসামান্য অর্জন তখনই অর্থবহ হবে, যখন কৃষকের জীবনমানও একইসঙ্গে উন্নীত হবে। বর্তমানে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১০.৯৪ শতাংশের মধ্যে থাকলেও এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অনেক বিস্তৃত। দেশের প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া অনেক মানুষ পরোক্ষভাবে কৃষি খাতের সঙ্গে জড়িত। কৃষিভিত্তিক ব্যবসা, সেবা, পরিবহন ও বস্তুর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর জীবিকা নির্ভরশীলতার ওপর ভিত্তি করে এ হিসাব করলে বাস্তবে কৃষি-সংক্রান্ত জীবিকার ওপর নির্ভরশীল জনগণের অংশগ্রহণ ৫০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে বলে বিভিন্ন গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার বিশ্লেষণে উল্লেখ আছে। ধান উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর মধ্যে অবস্থান, সবজি ও ফল উৎপাদনে ধারাবাহিক অগ্রগতি এবং মাছ উৎপাদনে বৈপ্লবিক সাফল্য বাংলাদেশের কৃষিকে একটি শক্ত ও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে।

কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, বাজার ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন এবং কৃষিকে প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই খাতে রূপান্তর করা এখন সময়ের দাবি। একটি কার্যকরী মূল্য সহায়তা ব্যবস্থা চালু করা গেলে, কৃষকরা উৎপাদনের আগে থেকেই একটি ন্যূনতম মূল্য নিশ্চয়তা পাবেন, যা তাদের ঝুঁকি কমাবে

লেখক
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
প্রকল্প পরিচালক, এলএসটিডি প্রকল্প
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, কৃষিজ উৎপাদনের এই সাফল্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কৃষকের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে অস্বাভাবিকভাবে দাম কমে গিয়ে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এই বৈপরীত্যের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো, বাজার ব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা। কৃষিপণ্য উৎপাদনের পর তা ভোক্তার হাতে পৌঁছাতে একাধিক স্তর অতিক্রম করতে হয়, যেখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য দৃশ্যমান। ফলে ভোক্তা যে দামে পণ্য ক্রয় করেন, তার খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ কৃষকের হাতে পৌঁছায়। মৌসুমভিত্তিক ফসলের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। যখন উৎপাদন বেশি হয়, তখন বাজারে সরবরাহ বেড়ে গিয়ে দাম কমে যায়, আবার ঘাটতির সময় দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই অস্থিতিশীলতা কৃষকের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ভোক্তার জন্যও অসুবিধাজনক। উৎপাদন ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি কৃষকদের জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। একটি দৈনিক পত্রিকার তথ্যমতে, সার উৎপাদনের খরচ সম্প্রতি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার কারখানাগুলোর জন্য গ্যাসের দাম ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে সার উৎপাদনের খরচ তীব্রভাবে বেড়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় কৃষকদের জন্য সরকারি ভর্তুকির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, খুচরা ও পাইকারি দোকানগুলো কিছু কিছু সময় সরকারিভাবে নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় প্রতিকেজি ৪-৭ টাকা বেশি দামে সার বিক্রি করছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, বোরো ধানের মোট উৎপাদন খরচ প্রায় ২৫-৩০ শতাংশের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কৃষকের লাভের মার্জিন কমাচ্ছে। এছাড়াও বীজ, কীটনাশক, সেচ, শ্রম এবং জ্বালানির খরচ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণের কার্যকর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনো গড়ে ওঠেনি। ফলে কৃষকরা অনেক সময় উচ্চ ঝুঁকি নিয়ে ফসল উৎপাদন করেও প্রত্যাশিত লাভ থেকে বঞ্চিত হন। এই বাস্তবতায় কৃষিকে লাভজনক খাতে রূপান্তর করতে হলে মূল্য নির্ধারণ ও বাজার ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বের উন্নত কৃষি অর্থনীতির দেশগুলো এই ক্ষেত্রে কার্যকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। চীন, নেদারল্যান্ডস, রাশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নত দেশগুলোতে কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সরকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাজারে হস্তক্ষেপ করে থাকে। কৃষকদের জন্য ন্যূনতম মূল্য নিশ্চয়তা, ভর্তুকি, কৃষি বীমা এবং আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। কৃষক সমবায় বা প্রযোজক সংগঠনের মাধ্যমে সরাসরি বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করায় মধ্যস্বত্বভোগীর প্রভাব কমেছে এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে কৃষি খাতের আধুনিকায়নের জন্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। বর্তমানে পর্যাপ্ত হিমাগার ও সংরক্ষণ সুবিধার অভাবে কৃষকরা অনেক সময় বাধ্য হয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করেন। বিশেষ করে আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা শাকসবজি ও ফলমূলের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা গেলে কৃষকরা বাজারের উপযুক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবেন এবং ন্যায্যমূল্য পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। একইসঙ্গে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে তোলা গেলে কৃষিজ পণ্যের অপচয় লক্ষণীয় মাত্রায় হ্রাস পাবে এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষি খাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। বর্তমানে মোবাইলভিত্তিক তথ্যসেবা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং বাজারমূল্য সংক্রান্ত তথ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। উদাহারণসরূপ ‘কৃষি কল সেন্টার’ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন কৃষকদের জন্য মোবাইল ভিত্তিক পরামর্শ সেবা (ফসল পরিচর্যা, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ ও আবহাওয়ার তথ্য) ইত্যাদি সরবরাহ করে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন LSTD প্রজেক্ট কর্তৃক নতুন উদ্ভাবিত ‘বাংলা ধান ইনফো’ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ধানের উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে। ‘Rice Knowledge Bank’-সহ আরও বেশ কিছু মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের ফলে ধান, গমসহ অন্যান্য শস্যের সুষ্ঠু উৎপাদনব্যবস্থা এখন কৃষকদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে।

ভবিষ্যতে ড্রোন প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডাটা-নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনা চালু করা গেলে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা গেলে বাজারব্যবস্থার স্বচ্ছতা বাড়বে এবং কৃষক ন্যায্যমূল্য পাওয়ার সুযোগ পাবেন। জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের কৃষির জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, উত্তরাঞ্চলে খরা এবং বর্ষাকালে বন্যা কৃষি উৎপাদনকে অনিশ্চিত করে তুলছে। পশ্চিমাঞ্চলের চুয়াডাঙ্গা জেলায় গত পাঁচ বছরে খরা ও তাপজটের কারণে কৃষিতে বার্ষিক ক্ষতি কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে বলে বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক জরিপে দেখা গেছে। বর্তমানে কয়েক মিলিয়ন হেক্টর জমি লবণাক্ততায় আক্রান্ত যা ক্রমাগত আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বাড়ায় আমন ও আউশ ধানের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কৃষি অর্থায়ন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ঘাটতি রয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তি এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক কৃষক প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন না। একইসঙ্গে কৃষি বীমা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারা পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারেন না। এই বাস্তবতায় কৃষি বীমা সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল আর্থিক সেবার মাধ্যমে দ্রুত ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের কৃষিকে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে, যুব ও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অপরিহার্য। বর্তমানে অনেক তরুণ কৃষিকে পেশা হিসেবে নিতে অনাগ্রহী হলেও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক কৃষি ও এগ্রো-উদ্যোক্তা কার্যক্রম তাদের আকৃষ্ট করতে পারে। একইভাবে নারী কৃষকদের প্রশিক্ষণ, অর্থায়ন ও বাজার সংযোগ নিশ্চিত করা গেলে কৃষি খাত আরও শক্তিশালী হবে। নীতিগত দিক থেকে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা একটি বড় সমস্যা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা গেলে কৃষি খাতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। শুধুমাত্র নীতিমালা প্রণয়ন করলেই হবে না, তার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমান নির্বাচিত সরকারের জন্য কৃষি খাতকে নতুনভাবে অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় এখনই। কৃষি শুধু খাদ্য উৎপাদনের খাত নয় বরং এটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তাই কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত, বাজার ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন এবং কৃষিকে প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই খাতে রূপান্তর করা এখন সময়ের দাবি। একটি কার্যকরী মূল্য সহায়তা ব্যবস্থা চালু করা গেলে, কৃষকরা উৎপাদনের আগে থেকেই একটি ন্যূনতম মূল্য নিশ্চয়তা পাবেন, যা তাদের ঝুঁকি কমাবে। একইসঙ্গে কৃষিপণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলকে আধুনিক ও দক্ষ করতে হবে, যাতে কৃষক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয়। কৃষিপণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনাও কাজে লাগাতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়। পরিবেশবান্ধব কৃষিচর্চা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদে মাটির উর্বরতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং পরিবেশের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। তাই জৈব কৃষি, সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষি খাত একদিকে যেমন সাফল্যের গল্প বহন করে, অন্যদিকে তেমনি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই বাস্তবতায় কৃষিকে একটি আধুনিক, টেকসই ও বাজার-সংযুক্ত খাতে রূপান্তর করতে হলে সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প নেই। সঠিক নীতি, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকে একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশায় রূপান্তর করা সম্ভব। এটি কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নয় বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই সমাজ গঠনের জন্যও অপরিহার্য।